বাংলা কবিতা ও অণুগল্প: সম্পর্কের রসায়ন

রাজু বিশ্বাস

মান্ধাতাও তার সমকালকে নিশ্চয়ই আধুনিক বলতেন। অনিবার্যভাবে প্রাচীন হয়ে যাওয়া কবিতাকে নাই বা আধুনিক বললাম। তাতে কিছু এসে যায় না। এই সময়ের বাংলা কবিতার সহযাত্রী ও সহমর্মী হিসেবে বাংলা অণুগল্প বর্তমানকালে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে। বাংলা অণুগল্পের প্রথম সার্থক স্রষ্টা বনফুল। এতো কম কথায় মানবজীবনের এমন নিখুঁত চিত্রায়ণ তাঁর আগে বাংলায় তেমন কেউ করতে পারেননি। তবে সাহিত্যের গণেশ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'লিপিকা' গ্রন্থে অণুগল্পের ভিতটিকে মজবুত করে গিয়েছিলেন। সেখান থেকেই কবিতা আর অণুগল্পের একসঙ্গে পথচলা শুরু। 'সতেরো বছর' শিরোনামের কথিকাটি একদিকে অসাধারণ গীতিকবিতা অপর দিকে একটি সার্থক অণুগল্প:

> আমি তার সতেরো বছরের জানা।
> কত আসাযাওয়া, কত দেখাদেখি, কত বলাবলি, তারই আশেপাশে কত স্বপ্ন, কত অনুমান, কত ঈশারা, তারই সঙ্গে সঙ্গে কখনো বা ভোরের ভাঙা ঘুমে শুকতারার আলো, কখনো বা আষাঢ়ের ভরসন্ধ্যায় চামেলি ফুলের গন্ধ, কখনো বা বসন্তের শেষ প্রহরে ক্লান্ত নহবতের পিলুবারোয়াঁ; সতেরো বছর ধরে এই সব গাঁথা পড়েছিল তার মনে...

কিচ্ছু না। কেবল ছবি। কেবল স্মৃতি। হয়তো সতেরো বছরের কিশোর রবীন্দ্রনাথ আরো সতেরো বছর পরে রোমন্থন করেছেন বৌদি কাদম্বরী দেবীর স্মৃতি। কতকগুলি শব্দ দিয়ে ছবি এঁকে গল্পের ক্ষণিক আভাস সৃষ্টি করেছেন। লাইনগুলোকে ভেঙে দিলেই তা একটি সার্থক কবিতা হয়ে উঠতে পারতো। রবীন্দ্রনাথ 'লিপিকা'র লেখাগুলি সম্পর্কে নির্মলকুমারী মহলানবিশকে ১৯২৯-এর শ্রাবণে একটি চিঠিতে লিখেছেন:

> কখনো কখনো গদ্যরচনায় সুর সংযোগ করবার ইচ্ছা হয়। লিপিকা কি গানে গাওয়া যায় না ভাবছো।
> ('পত্রাবলী', নির্মলকুমার মহলানবিশকে লেখা ১২৪ সংখ্যক পত্র, 'দেশ', ২২ এপ্রিল, ১৯৬১, পৃ: ৯১৫)

রবীন্দ্রনাথের লেখায় গান কবিতা ও গল্পের ত্রিবেণিসংগম ঘটেছে। তবে এই সময় যেহেতু রাবীন্দ্রিক আবহের নয়, অনিবার্যভাবেই তাই বর্তমানকালের কবিতার মতো অণুগল্পে নেই সেই ছান্দিকতা, রোম্যান্টিক বিষাদবিলাস। যাপিত জীবনের প্রাত্যহিকতার পীড়নে সে ধ্বস্ত। বনফুলের 'নিমগাছ' গল্পে বিস্ময়করভাবে অব্যর্থ শব্দ প্রয়োগে উঠে এসেছিল জীবনের এক মর্মস্পর্শী রূপ:

> কেউ ছালটা ছাড়িয়ে নিয়ে সিদ্ধ করছে
> পাতাগুলো ছিঁড়ে শিলে পিষছে কেউ।
> কেউ বা ভাজছে গরম তেলে।
> খোস দাদ হাজা চুলকানিতে লাগাবে...

হঠাৎ একদিন এক নতুন ধরনের লোক এলো।
মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো নিম গাছের দিকে। ছাল তুললো না, পাতা ছিঁড়লো না। ডাল ভাঙলো না।
মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো শুধু।
বলে উঠলো,— 'বাঃ কি সুন্দর পাতাগুলি... কী রূপ! থোকা থোকা ফুলেরই বা কি বাহার... এক ঝাঁক
নক্ষত্র নেমে এসেছে যেন নীল আকাশ থেকে সবুজ সায়রে বাঃ—'
খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে চলে গেল।
কবিরাজ নয়, কবি।
নিমগাছটার ইচ্ছা করতে লাগল লোকটার সঙ্গে চলে যায়। কিন্তু পারলো না। মাটির ভিতর শিকড় অনেক দূর চলে গেছে। বাড়ির পিছনে আবর্জনার স্তূপের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইলো সে।
ওদের বাড়ির গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মী বউটার ঠিক এই দশা।

এ ভাবে বনফুল অণুগল্পের অত্যল্প পরিসরে যে ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছেন তা কবিতার প্রাণ। লাইনগুলিও কবিতার মতো বিন্যস্ত। বিষয়ের গভীরতায়, ভাষার নির্মাণে, শব্দের প্রয়োগে অমলিন হয়ে 'নিমগাছ' একদিকে অসাধারণ একটি অণুগল্প ও অন্যদিকে একটি সার্থক কবিতা হয়ে উঠেছে।

কবিতার যেমন কোনো সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নেই, তেমনি অণুগল্পেরও নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে কিছু বৈশিষ্টকে অবশ্যই চিহ্নিত করা যায়—

ক) অণুগল্প মোটের উপর একপাতার মধ্যে সমাপ্ত হবে। তবে মনে রাখতে হবে পরিসরে ছোট হলেই যে কোনো গল্প অণু হবে এমন কথা নেই।

খ) অণুগল্পের কাঠামো হবে সুগঠিত। সেখানে পরিবেশের চেয়ে অধিক জরুরি ভাষা ও ভাবের মেলবন্ধন।

গ) ভাবটিকে ধারালো ও একান্ত করে তুলতে ন্যূনতম যতোগুলো শব্দ ও বাক্য প্রয়োজন, তার সামান্য অতিরিক্ত মেদের বিলাসিতা এখানে চলে না।

ঘ) অণুগল্পের শেষে আকস্মিক চমক নাও থাকতে পারে। তবে সামগ্রিকভাবে গল্পের শেষে পাঠকের বোধকে বিদ্ধ করার মতো ব্যঞ্জনাই অণুগল্পের প্রাণ।

ঙ) একটা থেকে দুটি চরিত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়। তবে অণুগল্পের ক্ষেত্রে চরিত্র থাকাটা অপরিহার্য নয়।

এ সময়ের বহু অণুগল্পের ক্ষেত্রে আমরা দেখি লেখকের ভাবনায় একান্ত উন্মোচন ঘটছে। সেখানে আলাদা কোনো চরিত্রের অস্তিত্ব নেই। ঠিক এখানেই কবিতার সঙ্গে অণুগল্প কোথাও যেন এক হয়ে গেছে। একটি সম্পূর্ণ নতুন আর্টফর্ম হিসেবে অণুগল্প এ সময়ের পাঠকের কাছে সাদরে গৃহীত হলেও সংরূপগতভাবে কবিতার সঙ্গে তার সম্পর্কের রসায়ন অনেক গভীর। কবি অরুণ মিত্র কবিতার লাইনগুলোকে ভেঙে না দিয়ে টানা

গদ্যের মতো করে বহু কবিতা লিখেছেন। পরবর্তীকালে ভাস্কর চক্রবর্তী সহ অনেকেই এই ফর্মটিকে গ্রহণ করেছিলেন। অরুণ মিত্রের 'অমরতার কথা'য় আমরা দেখতে পাবো এ সময়ের অণুগল্পের ধাঁচটি বহু আগেই কবিতায় কীভাবে চলে এসেছিল:

> বাসনগুলো এক সময়ে জলতরঙ্গের মতো বেজে উঠবে। তার দেয়াল ছাপিয়ে পৃথিবীকে ঘিরে ফেলবে। তখন হয়তো এই ঘরের চিহ্ন পাওয়া যাবে না। তবু আশ্চর্যকে জেনো। জেনো এইখানেই আমার হাহাকারের বুকে গাঢ় গুঞ্জন ছিল। ... ওরা আবার বন্য হ'য়ে উঠবে। আমার ছাত দেওয়াল মেঝের শূন্যতা ভ'রে অরণ্য জাগবে। সবুজের প্রতাপে এই শুকনো কাঠামো চূর্ণ হবে। সেই ধ্বংসের গহনে খুঁজে নিয়ো আমার বসতি, সেখানে পোড়ামাটি-ইটের ভিতরে রস ছিল অমৃতের মতো।

এখানে গল্পের একটা স্কেচ আছে মাত্র। সেই অর্থে কোনো চরিত্র বা গল্প নেই। কবির স্বগতভাষণে বেজে উঠেছে বস্তু জীবনের নশ্বরতার মধ্যেও অমরতার বিষণ্ণ অনুভব। এই সময়ের একজন ব্যতিক্রমী গল্পকার অমিত মুখোপাধ্যায় তাঁর গল্পে এ ভাবেই জীবনের গভীর সত্তার উন্মোচন ঘটান। 'ইসক্রা' শারদ সংখ্যা, ২০১৪-তে প্রকাশিত 'পার করো আমারে' গল্পের বিষয়বস্তু অভিনব, তবে তার চেয়ে আশ্চর্য কবিত্বময় লেখকের ভাষা ও উপস্থাপন ভঙ্গি। সুন্দরবনের চর পড়ে যাওয়া নদীতে রাতের বেলা পার হতে যাওয়া কয়েকজন বিপন্ন নারী পুরুষ এবং সঙ্গে গল্পের কথক। এখানে লেখক যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে যেন নিখুঁত এক কবিতাজগত নির্মিত হয়েছে:

> মাঝি তাকায়। নৌকা ফাঁকায় লাফায়, খোলের গর্ত গহন দেখায়। একাদশীর চাঁদ আঁকা-বাঁকা খেলা করে। ওপারে আমার গতি, আরো পৃথিবী পেরিয়ে তবে বসতি। পেছনপানে সুন্দরবনের পিকিতি, আঁধারে মেঠো নিভৃতি। শেষ ট্রেনের লগ্ন বয়ে যায় ভাঁটায়।
>
> আমি মাঝ নদীতে। মন তরে কেবা পার করে!

এমন কবিতাময়তা, এমন মেঠো নিভৃতি প্রাণের নির্জন অলিন্দে ভিন্ এক অনুভবের জন্ম দেয়। কবিতায় গল্প বলার চল বহু দিনের। রবীন্দ্রনাথের 'কথা' ও 'কাহিনী' কাব্যের প্রত্যেকটি কবিতাই এক একটি গল্প। এ জন্যই কবি সচেতনভাবেই এ কাব্যের নাম দিয়েছিলেন 'কথা' ও 'কাহিনী'। তবে এখানে গল্পগুলি বেশ বড়ো। অণুগল্পের ভাব ও ব্যঞ্জনা কিছুই প্রায় এখানে নেই। পরবর্তীতে কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সরাসরি কবিতার গল্প বলার ভঙ্গি নিয়ে এলেন। গল্প নয় গল্পের আমেজ। আসলে পুরো গল্প কখনোই লেখেন না কবি। সেটুকু আভাস, যা বড়ো এক সত্যকে তুলে ধরার জন্য নিতান্ত জরুরি। এখানেই তৈরি হয় এক সমস্যা। কতটা গল্প, কতটুকুই বা কবিতা? কোন সঠিক মাত্রায় এ-দুইকে মেশালে নষ্ট হয় না কবিতার ভারসাম্য? 'কলকাতার যিশু' কিংবা 'উলঙ্গ রাজা'-তে কবি অণুগল্পের মতোই বাচনভঙ্গি ও ভাষাবিন্যাসে ফুটিয়ে তোলেন জীবনের গভীর সত্যের অনুভব। যা পাঠককে একই সঙ্গে গল্প ও কবিতার রস প্রদান করে। 'জঙ্গলে এক উন্মাদিনী' কাব্যের প্রথমেই আছে একটি অণুকবিতা 'থলকোবাদে', যা এই সময়ের অণুগল্পেরই সমধর্মী:

শুকনো শালপাতার উপর দিয়ে কেউ / হেঁটে যাচ্ছে/ থলকোবাদের পাহাড়চূড়ার
বাংলোয় শুয়ে মাঝরাত্তিরে এই শব্দ শুনি/ বাঘ? নাকি সেই মানুষেরা, যারা বাঘের
চেয়েও ভয়ঙ্কর? সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি,/ উপত্যকায় ছড়িয়ে আছে রোদ্দুর।/
মাঝরাত্তিরের সেই ব্যাপারটাকে এখন/ স্বপ্ন বলে মনে হয়।

২

সম্প্রতি পত্রপত্রিকাগুলি অণুসাহিত্যচর্চার উপর বেশ জোর দিচ্ছে। বাণিজ্যিক কাগজেও অণুগল্প স্থান পাচ্ছে। এটা সময়ের দাবি। অস্বীকার করে লাভ নেই যে মানুষের ব্যস্ততা বহুগুণে বেড়েছে। আধুনিক প্রযুক্তিবিশ্ব বিশ্বায়নের উন্মুক্ত বাজারে প্রাণের সম্পদকেও পণ্য করে তুলেছে। অনিবার্যভাবে গল্প কবিতায় সে ছাপ পড়ছে। তাই মানুষ আর আগের মতো করে সব কিছুকে ভাবতে পারছে না। বিষয়ে ভাবনায় ঘটেছে আমূল পরিবর্তন। ইন্টারনেটের কল্যাণে হাতের মুঠোয় পৃথিবী পেলেও মানুষ শান্তি পাচ্ছে না। সে আজো কবিতা লেখে, গল্প বানায়। ফেসবুকে ছাড়ে। মোবাইলে কবিতা লিখে কবি সম্মেলনে পাঠ করে। সৃষ্টির এই বিচিত্র পন্থাকে গ্রহণ না করে উপায় নেই। আজকের গল্পকবিতাও জীবনের মতো ছোটো হয়ে আসছে। যদিও গোস্পদে আকাশদর্শনের আনন্দ সেখানে আছে। তাই পাঠক-দর্শকও তাকে স্বাগত জানাচ্ছে। অণুগল্প এখন বেশ জনপ্রিয় সাহিত্যসংরূপ হলেও সিনেমার ক্ষেত্রে ছোট্ট ছবি বা Short film বহুদিন আগে থেকেই বেশ জনপ্রিয়। বিশ্বের প্রতিটি উন্নত ও ডন্নয়নশীল দেশে সিনেমা ও সাহিত্যের দৈর্ঘ্য ছাটা হচ্ছে। আমাদের দেশে সত্যজিৎ রায় থেকে শুরু করে বর্তমানের বহু নামি পরিচালক ছোট্ট ছবি বানিয়েছেন। এর দৈর্ঘ্য পাঁচ মিনিট বা তিরিশ মিনিটও হতে পারে। তবে 'অণুসিনেমা' বলে এখনো কোনো পরিভাষা তৈরি হয়নি।

জাপানে এক সময়ে দু'তিন লাইনে লেখা কবিতা 'হাইকু' বেশ জনপ্রিয় ছিল। যেখানে খুব কম শব্দের মাধ্যমে একটা অনুভূতিকে ধরে ফেলা হতো। বর্তমানে অণুগল্প নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। সুইজারল্যান্ডের প্রখ্যাত গল্পকার পিটার বিশেল (১৯৩৫)-এর 'to the city of paris' গল্পের চার লাইনের একটি গল্প 'পেশা'। এখানে গভীর ব্যঞ্জনা এনেছেন লেখক। যা মাত্র চার লাইনের মধ্যেই অসাধারণ শিল্পসার্থকতা লাভ করেছে:

সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর আগন্তুকদের বিরক্তি লক্ষ্য করে যৌনকর্মীটি
একবার ভাবল, তাকে কিছু বলতে হবে। সাহস সঞ্চয় করে সে বলল, 'আমারও
ভাল লেগেছে।' সেই থেকে সকলকে সে একই কথা বলে আসছে।
সেই রকম ত্রিশ বছর ধরে প্রতিদিন অসংখ্য রোগি দেখে প্রত্যেকের সঙ্গে আলোচনার পর
জোরালো করমর্দন করে শল্য চিকিৎসক বলে যাচ্ছেন, 'সাহস রাখো, সাহস।'
(জয়ন্ত ভট্টাচার্য অনূদিত)

কবিতার ক্ষেত্রেও অনেক মিতভাষী হয়ে উঠছেন কবি। সেই অর্থে দীর্ঘ কবিতা লেখার প্রবণতা কমছে। বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব বসু থেকে শুরু করে পবিত্র মুখোপাধ্যায়, জয় গোস্বামী সকলেই কম বেশি সার্থক দীর্ঘ কবিতা লিখেছেন। তবে বর্তমানে দীর্ঘ

কবিতার সেই ধারাটি প্রায় লুপ্ত। অল্প কথায় যে গভীর ব্যঞ্জনাময়তা গড়ে তোলা যায় তা এ সময়ে বহু কবি প্রমাণ করে দিচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথ যতো বড়ো কবিই হোন না কেন অন্তত কবিতার ক্ষেত্রে তিনি মনের আবেগকে খুব বেশি সংযত করতে পারতেন না। শব্দসমুদ্র গড়ে তুলে তার পর তাঁর সোনারতরীটি জলে ভাসাতেন। যদিও গানের ক্ষেত্রে তিনি অনেক বেশি সংযমী শিল্পী। 'বসুন্ধরা' , 'যেতে নাহি দিব' ইত্যাদির মতো অসংখ্য পরিচিত কবিতায় একই বিষয় একই কথা বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে, যা পাঠকের মনে ক্লান্তির উদ্রেক করে। যেহেতু মানুষটা রবীন্দ্রনাথ, সেহেতু এ বিষয়ে কাউকে খুব বেশি উচ্চবাচ্য করতে দেখা যায় না। সময় বদলেছে। অণুগল্পের মতো কবিতাও তাই নিজের বপুকে সংকীর্ণ করে এনেছে। সুজিত সরকারের 'কিছুই চূড়ান্ত নয়' গ্রন্থের 'অনিশ্চয়' কবিতাটির কথা মনে আসছে:

> দশতলায়
> জ্যোৎস্নালোকিত বিছানায়
> চূড়ান্ত সংগম—
>
> একতলায়
> আগুন লেগেছে

অসাধারণ সংযমে শিল্পী এখানে ভয়ঙ্কর বৈপরীত্বের ছবি এঁকেছেন, যা হয়তো সাধারণ কোনো কবির হাতে হয়ে উঠতো এক মস্তবপু কবিতা। অদীপ ঘোষ আশির দশকের একজন উল্লেখযোগ্য কবি। তিনিও খুব কম শব্দ প্রয়োগ করে কবিতায় অসাধারণ ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেন।

অণুগল্পের সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক নিঃসন্দেহে অতি ঘনিষ্ট। যদিও প্রত্যেক শিল্পমাধ্যমের পারস্পারিক একটা আদান প্রদান থাকেই। গল্পে কবিতা, কবিতায় গল্প বলা হতেই পারে। তবে সে ক্ষেত্রে বিচার্য কবিতা বা গল্পের মূল রস সেখানে ক্ষুণ্ন হচ্ছে কি না। গল্পের আঙ্গিক এ বিষয় নিয়ে বহুদিন থেকেই পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম হয়ে উঠছে গল্প। বলাবাহুল্য সময়ই এই চাহিদা তৈরি করেছে। সময়ের দাবিকে কোনো শিল্পীই অস্বীকার করতে পারেন না। এই সময়ের লেখক প্রগতি মাইতি মূলত লিট্‌ল ম্যাগাজিনের লেখক। বহুদিন থেকে তিনি তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা 'ইসক্রা'-তে অণুগল্পচর্চার ধারাটিকে বহমান রেখেছেন। নিজে ছোটগল্প লেখার ক্ষেত্রে অনেকটা ট্রাডিশনাল হলেও অণুগল্প রচনার ক্ষেত্রে তিনি স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। অণুগল্প নিয়ে তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষা সচেতন পাঠকের নজর কেড়েছে। 'অণুগল্পসংগ্রহ ২' গ্রন্থের 'চিতাকাঠ' গল্পটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মাত্র চার লাইনের প্রগতি গল্পের মধ্যে এনেছেন তীব্র শ্লেষ ও ব্যঞ্জনা, যা পাঠককে এক অন্য বোধের জগতে নিয়ে যায়:

> দাউ দাউ চিতা জ্বলছে। অন্ধকারে সব্বার মুখ আগুনমাখা। ডোম বলল, আরো কাঠ লাগবে। কে যেন অন্ধকার থেকে বলে উঠল, পাপ পোড়াতে কাঠ তো বেশি লাগবেই।

প্রগতির অতি সাম্প্রতিক একটি গল্পের কথা মনে পড়ছে। এর চেয়ে কম শব্দে পৃথিবীর কোথাও গল্প লেখা হয়েছে কিনা জানা নেই। গল্পটির নাম 'স্বাবলম্বী':

অ... ... ...ঔ

—ও।

মাত্র তিনটি বর্ণে সমাপ্ত এই গল্পে আপাতভাবে কোনো চমৎকারিত্বের সৃষ্টি না হলেও পাঠকের বোধের কাছে এক ভিন্ন আবেদন নিয়ে দাঁড়ায় এ গল্প। গল্প হিসেবে কতটা উৎকৃষ্ট সে বিচার সময় করবে। তবে অণুগল্প নিয়ে যে ব্যাপক পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে তাকে সাধুবাদ জানাতেই হয়। বর্তমানকালে আরো অনেকেই অণুগল্পের চর্চাকে আরো ব্যাপ্ত ও প্রসারিত করে তুলছেন। তাদের সকলকেই স্বাগত।

৩

সময় বড়ো মোহিনী। ধ্যানমগ্ন পাহাড়ের মতো তার নিরাসক্তি। কালের চাকায় গুঁড়িয়ে যায় অনেক বড়ো বড়ো নির্মাণ। সভ্যতা ভাঙে, সভ্যতা গড়ে। মানুষের মৃত্যু হয়, তবু 'মানব বেঁচে থাকে'। হাজার বছর ধরে সে পৃথিবীর মাটিতে পথ হাঁটতে পারে। অনাগতকালের কাছে রেখে যায় তার সৃষ্টির বিচিত্র স্বাক্ষর। কখনো গুহার দেওয়ালে, কখনো কাগজে, কখনো আবার সেলুলয়েডের পর্দায়। কিছু থাকে। বেশিরভাগই ধ্বংস হয়। তবুও মানুষ নিজেকে প্রকাশ করার নেশায় ব্যাকুল। প্রেম দুঃখ আনন্দ বেদনায় ঘৃণা প্রতিবাদে গড়া তার বিচিত্র সৃষ্টির জগত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রকাশের ভঙ্গি বা ধরন হয়তো বদলায়; তবু বদলায় না মানুষের চিরন্তন কিছু অনুভব। অণুগল্প কবিতা উপন্যাস প্রবন্ধ যাই হোক না কেন মানুষের সেই অনুভব বার বার ফিরে ফিরে আসে। প্রত্যেক মানুষই কম বেশি কবি। সে জীবনানন্দ যতই বলুন না কেন, 'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি।' এ জন্যই মানুষের কথায়-কাহিনীতে কিছু কবিতা মিশে থাকে। চূড়ান্ত ব্যর্থ মানুষটার জীবনেও কিছু কবিতা থাকে। তাই সে বাঁচে। অন্তত এই পৃথিবীর আলো বাতাস, পাখির গান, বৃষ্টি পতনের শব্দের জন্য সে বাঁচে।